কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৬

সূরা হাদীদ ২০-২৯ আয়াত

اِعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَا الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَا لَعِبٌ وَّ لَہۡوٌ وَّ زِیۡنَۃٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَیۡنَکُمۡ وَ تَکَاثُرٌ فِی الۡاَمۡوَالِ وَ الۡاَوۡلَادِ ؕ کَمَثَلِ غَیۡثٍ اَعۡجَبَ الۡکُفَّارَ نَبَاتُہٗ ثُمَّ یَہِیۡجُ فَتَرٰىہُ مُصۡفَرًّا ثُمَّ یَکُوۡنُ حُطَامًا ؕ وَ فِی الۡاٰخِرَۃِ عَذَابٌ شَدِیۡدٌ ۙ وَّ مَغۡفِرَۃٌ مِّنَ اللّٰہِ وَ رِضۡوَانٌ ؕ وَ مَا الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الۡغُرُوۡرِ

২০. তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব-অহংকার, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এর উপমা হলো বৃষ্টি, যার উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর সেগুলো শুকিয়ে যায়, ফলে আপনি ওগুলো পীতবর্ণ দেখতে পান, অবশেষে সেগুলো খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মোটেই ভরসা করার যোগ্য নয়। পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে পার্থিব জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এইঃ প্রথমে ক্রীড়া, এরপর কৌতুক, এরপর সাজ-সজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা, এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ। لَعِبٌ শব্দের অর্থ এমন খেলা, لَهْوٌ এমন খেলাধুলা, যার আসল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন زِينَةٌ বা অঙ্গ-সজ্জা, পোশাক ইত্যাদির মোহ সর্বজনবিদিত। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম অংশ ক্রীড়া অর্থাৎ لَعِبٌ এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরপর لَهْوٌ শুরু হয়। এরপর সে অঙ্গসজ্জায় ব্যাপৃত হয় এবং শেষ বয়সে সমসাময়িক ও সমবয়সীদের সাথে وَتَفَاخُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ বা প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। উল্লেখিত ধারাবাহিকতায় প্রতিটি অর্থেই মানুষ নিজ অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু কুরআন পাক বলে যে, এই সবই হচ্ছে সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। [দেখুন: সা'দী, তাবারী]

দুনিয়ায় মানুষের কর্মকাণ্ড বর্ণনার পর পবিত্র কুরআন বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে, (كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا) এখানে غَيْث শব্দের অর্থ বৃষ্টি। الكفار শব্দটি মুমিনের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর অপর আভিধানিক অর্থ কৃষকও হয়। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ এ অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টি দ্বারা ফসল ও নানা রকম উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে যখন সবুজ ও শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, তখন কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কোনো কোনপ তাফসীরবিদ الكفار শব্দটিকে প্রচলিত অর্থে ধরে বলেছেন যে, এতে কাফেররা আনন্দিত হয়। [কুরতুবী] এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবুজ, শ্যামল ফসল দেখে কাফেররাই কেবল আনন্দিত হয় না, মুসলিমরাও হয়। জওয়াব এই যে, মুমিনের আনন্দ ও কাফেরের

আনন্দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। ফলে দুনিয়ার অগাধ ধন-রত্ন পেয়েও মুমিন কাফেরের ন্যায় আনন্দিত ও মত্ত হয় না। তাই আয়াতে কাফের আনন্দিত হয় বলা হয়েছে।

এরপর এই দৃষ্টান্তের সারসংক্ষেপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফসল ও অন্যান্য উদ্ভিদ যখন সবুজ শ্যামল হয়ে যায়, তখন দর্শক মাত্রই বিশেষ করে কাফেররা খুবই আনন্দিত ও মত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশেষে তা শুষ্ক হতে থাকে। প্রথমে পীতবর্ণ হয়, এরপরে সম্পূর্ণ খড়-কুটায় পরিণত হয়। মানুষও তেমনি প্রথমে তরতাজা ও সুন্দর হয়। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত এরূপই কাটে। অবশেষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং সবশেষে মরে মাটি হয়ে যায়। দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণনা করার পর আবার আসল উদ্দেশ্য- আখেরাতের চিন্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আখেরাতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, (وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ) অর্থাৎ আখেরাতে মানুষ এ দুটি অবস্থার মধ্যে যে কোন একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফেরদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্যে কঠোর আযাব রয়েছে।

অপরটি মুমিনদের অবস্থা; অর্থাৎ তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে। এরপর সংক্ষেপে দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ) অর্থাৎ এসব বিষয় দেখা ও অনুধাবন করার পর একজন বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারে যে, দুনিয়া একটি প্রতারণার স্থল। এখানকার সম্পদ, প্রকৃত সম্পদ নয়, যা বিপদমুহূর্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর আখেরাতের আযাব ও সওয়াব এবং দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এরূপ হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে আখেরাতের চিন্তা বেশী করবে। পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। [ইবনে কাসীর]

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

২১. তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সে জান্নাত লাভের প্রয়াসে, যা প্রশস্ততায় আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে। এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছে তিনি এটা দান করেন; আর আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

সারমর্ম এই যে, অক্ষমতা ও মৃত্যু আসার আগেই তুমি সৎকাজের পুঁজি সংগ্রহ করে নাও, যাতে জান্নাতে পৌছতে পার। অগ্রে ধাবিত হওয়ার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সৎকাজে অপরের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার উপদেশাবলীতে বলেনঃ তুমি মসজিদে সর্বপ্রথম গমণকারী এবং সর্বশেষ নির্গমণকারী হও। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, সালাতের জামাতে প্রথম তকবিরে উপস্থিত থাকার চেষ্টা কর। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] জান্নাতের পরিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ এর প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সূরা আলে-ইমরানে এই বিষয়বস্তুর আয়াতে سموات বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি একত্রিত করলে জান্নাতের প্রস্থ হবে। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা বেশী হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের বিস্তৃতি সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির চাইতে বেশী। তাছাড়া عرض শব্দটি কোনো সময় কেবল বিস্তৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থ বোঝানো উদ্দেশ্য থাকে না। উভয় অবস্থাতেই জান্নাতের বিশাল বিস্তৃতিই বোঝা যায়। [দেখুন: কুরতুবী]

আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার বদৌলতেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেনঃ

আপনিও কি তদ্রূপ? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আমিও আমার আমল দ্বারা জান্নাত লাভ করতে পারি না-আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুকম্প হলেই লাভ করতে পারি। [বুখারী: ৫৬৭৩, মুসলিম: ২৮১৬]

তাছাড়া জান্নাত যেমন একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে লাভ করা যায় তেমনিভাবে আল্লাহর ইবাদত করার সৌভাগ্য ও আল্লাহর আনুগত্যে প্রতিযোগিতা করার সামর্থ কেবল তাঁরই অনুগ্রহে লাভ করা যায়। তিনি যাকে এ ব্যাপারে সুযোগ দিবেন তিনিই কেবল তা লাভ করতে পারে। সুতরাং তাঁর কাছেই এ ব্যাপারে সার্বক্ষণিক তৌফিক চাইতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সালাতের পরে এ কথাটি স্মরণ করে বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হে মুআয! আমি তোমাকে ভালবাসি, সুতরাং তুমি সালাতের পরে اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ হে আল্লাহ্! আমাকে আপনার যিকর, শুকর এবং সুন্দর পদ্ধতিতে ইবাদত করার তৌফিক দিন। [আবু দাউদ: ১৫২২]

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অসচ্ছল সাহাবীগণ এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ধনীরা উঁচু মর্যাদা ও স্থায়ী নেয়ামতের অধিকারী হয়ে গেল। রাসূল বললেন, সেটা কি করে? তারা বললেন, আমরা যেমন সালাত আদায় করি তারাও তা করে, আমরা সাওম পালন করি, তারাও করে, অধিকন্তু তারা সাদাকাহ দেয়। কিন্তু আমরা তা দিতে পারি না। তারা দাসমুক্ত করে আমরা তা পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদেরকে কি আমি এমন বস্তু বলে দিব না যা করলে তোমরা অন্যদের প্রতিযোগিতায় অগ্রণী হয়ে যাবে? কেউ তোমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারবেনা। তবে যদি কেউ তোমাদের মত কাজ করে সেটা ভিন্ন কথা। তোমরা প্রতি সালাতের পরে তেত্রিশ বার করে তাসবীহ, তাকবীর ও তাহমীদ করবে। (সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও আলহামদুলিল্লাহ পড়বে)। পরবর্তীতে অসচ্ছল সাহাবাগণ ফিরে এসে বললেন, আমাদের পয়সাওয়ালা ভাইরা আমরা যা করছি তা শুনে ফেলেছে এবং তারাও তা করতে আরম্ভ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। [বুখারী: ৮৪৩, মুসলিম: ৫৯৫]

مَآ اَصَابَ مِنۡ مُّصِيۡبَةٍ فِى الۡاَرۡضِ وَ لَا فِىۡۤ اَنۡفُسِكُمۡ اِلَّا فِىۡ كِتٰبٍ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ نَّبۡرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيۡرٌ

২২. যমীনে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয়ই আসে তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমরা তা কিতাবে লিপিবদ্ধ রেখেছি নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষে এটা খুব সহজ।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, যমীনের বুকে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ লওহে-মাহফুযে জগত সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। যমীনের বুকে সংঘটিত বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَ لَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ

২৩. এটা এ জন্যে যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য আনন্দিত না হও। নিশ্চয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন না কোন উদ্ধত অহংকারীদেরকে—

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বিপদ অথবা সুখ, আনন্দ অথবা দুঃখের সম্মুখীন হয়, তা সবই আল্লাহ তা'আলা লাওহে-মাহফুযে মানুষের জন্মের পূর্বেই লিখে রেখেছেন। হাদীসে এসেছে, "আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে যাবতীয় তাকদীর নির্ধারণ করে নিয়েছেন"। [মুসলিম: ২৬৫৩] এ বিষয়ের সংবাদ তোমাদেরকে এ জন্য দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার ভাল-মন্দ অবস্থা নিয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনা না কর। দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদাপদ তেমন আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থসম্পদ তেমন উল্লসিত ও মত্ত হওয়ার বিষয় নয় যে, এগুলোতে মশগুল হয়ে তোমরা আল্লাহর স্মরণ ও আখেরাত সম্পর্কে গাফেল হয়ে যাবে। প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোনো কোনো বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোনো কোনো বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে, বিপদের সম্মুখীন হলে সবর করে আখেরাতের পুরস্কার ও সওয়াব অর্জন করতে হবে এবং সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও সওয়াব হাসিল করতে হবে।

এ আয়াতে সুখ ও ধন-সম্পদের কারণে উদ্ধত্য ও অহংকারীদের নিন্দা করা হয়েছে, বলা হয়েছে, আল্লাহ উদ্ধত্য অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার নেয়ামত পেয়ে যারা অহংকার করে, তারা আল্লাহর কাছে ঘৃণার্হ।

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَ يَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

২৪. যারা কার্পণ্য করে ও মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয় এবং যে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে জেনে রাখুক নিশ্চয় আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, চির প্রশংসিত।

সে সময় মুসলিম সমাজের মুনাফিকদের যে চরিত্র সবারই চোখে পড়ছিলো এখানে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঈমানের বাহ্যিক স্বীকারোক্তি অনুসারে মুনাফিক ও খাঁটি মুসলমানদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা না থাকার কারণে খাঁটি ঈমানদারদের যে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিলো, তারা তাতে শামিল হয়নি। তাই তাদের অবস্থা ছিল এই যে, আরবের অতি সাধারণ একটা শহরে যে নাম মাত্র স্বচ্ছলতা ও পৌরহিত্য তারা লাভ করেছিলো তাতেই তারা যেন গর্বে স্ফীত হয়ে উঠছিলো এবং ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো। তাদের মনের সংকীর্ণতা এমন পর্যায়ের ছিল যে, তারা যে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার, যে রসূলের অনুসারী হওয়ার এবং যে দ্বীন মানার দাবী করতো, তার জন্য নিজেরা একটি পয়সাও ব্যয় করবে কি, অন্য দাতাদেরও একথা বলে ব্যয় করা থেকে বিরত রাখতো যে, তোমরা নিজের অর্থ এভাবে অপচয় করছো কেন? স্পষ্ট কথা দুঃখ-কষ্টের উত্তপ্ত কুণ্ডে যদি জ্বালানো না হতো, তাহলে এই কৃত্রিম পদার্থগুলো---যা আল্লাহর কোনা কাজে লাগার মত ছিল না---খাঁটি সোনা থেকে পৃথক করা যেতো না। আর তাকে আলাদা করা ছাড়া দুর্বল ও খাঁটি মুসলমানদের এই সংমিশ্রিত সমাবেশকে দুনিয়ার নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ মহান পদটি অর্পণ করা যেতো না, যার বহুবিধ মহতী কল্যাণ খিলাফতে রাশেদার যুগে দুনিয়া অবলোকন করেছিলো।

উপদেশ বাণী শোনার পরও যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের জন্য আন্তরিকতা, আনুগত্য এবং ত্যাগ ও কুরবানীর পন্থা অবলম্বন না করে এবং নিজের বক্রতা আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় যা আল্লাহ অপছন্দ করেন--- তাহলে আল্লাহর তাতে কোন পরোয়া নেই। তিনি অভাব শুন্য, এসব লোকের কাছে তাঁর কোন প্রয়োজন আটকে নেই, আর তিনি অতিশয় প্রশংসিত, তাঁর কাছে উত্তম গুণাবলীর অধিকারী লোকেরাই গ্রহণযোগ্য হতে পার। দুষ্কর্মশীল লোকেরা তাঁর কৃপা দৃষ্টিলাভের উপযুক্ত হতে পারে না।

قَدۡ اَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِالۡبَيِّنٰتِ وَ اَنۡزَلۡنَا مَعَهُمُ الۡكِتٰبَ وَ الۡمِيۡزَانَ لِيَقُوۡمَ النَّاسُ بِالۡقِسۡطِ ۚ وَ اَنۡزَلۡنَا الۡحَدِيۡدَ فِيۡهِ بَاۡسٌ شَدِيۡدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعۡلَمَ اللّٰهُ مَنۡ يَّنۡصُرُهٗ وَ رُسُلَهٗ بِالۡغَيۡبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيۡزٌ

২৫. অবশ্যই আমরা আমাদের রাসূলগনকে পাঠিয়েছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়ের পাল্লা, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমরা আরও নাযিল করেছি লোহা যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধা কল্যাণ। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দেন কে গায়েব অবস্থায়ও তাকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহা শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

بينات শব্দের আভিধানিক অর্থ সুস্পষ্ট বিষয়। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বিধানাবলীও হতে পারে; তাছাড়া এর উদ্দেশ্য মু'জিযা এবং রেসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও হতে পারে; কারণ পরবর্তী বাক্যে কিতাব নাযিলের আলাদা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং بينات বলে মু'জিযা ও প্রমাণাদি বোঝানো হয়েছে এবং বিধানাবলীর জন্যে কিতাব নাযিল করার কথা বলা হয়েছে।

আয়াতে কিতাবের ন্যায় মিযানের বেলায়ও নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। কিতাব নাযিল হওয়া এবং ফেরেশতার মাধ্যমে নবী-রাসূলগণ পর্যন্ত পৌছা সুবিদিত। কিন্তু মিযান নাযিল করার অর্থ কি? এ সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীরে বিভিন্ন উক্তি এসেছে, কোন কোন মুফাসসির বলেন, মীযান নাযিল করার মানে দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিধানাবলী নাযিল করা। কারও কারও মতে, প্রকৃতপক্ষে কিতাবই নাযিল করা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন ও আবিষ্কারকে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। কাজেই আয়াতের অর্থ যেন এরূপ আমি কিতাব নাযিল করেছি ও দাড়িপাল্লা উদ্ভাবন করেছি। তাছাড়া আয়াতে কিতাব ও মিযানের পর লৌহ নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। এখানেও নাযিল করার মানে সৃষ্টি করা হতে পারে। পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায়ও নাযিল করা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। [সূরা আয-যুমার: ৬] অথচ চতুষ্পদ জন্তু আসমান থেকে নাযিল হয় না-পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। সেখানেও সৃষ্টি করার অর্থ বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি করাকে নাযিল করা শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহুপূর্বেই লওহে-মাহফুযে লিখিত ছিল—এ দিক দিয়ে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান থেকে অবতীর্ণ। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

এতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকজা আবিস্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোনো শিল্প চলতে পারে না।

وَ لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا نُوۡحًا وَّ اِبۡرٰهِيۡمَ وَ جَعَلۡنَا فِىۡ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الۡكِتٰبَ فَمِنۡهُمۡ مُّهۡتَدٍ‌ ۚ وَ كَثِيۡرٌ مِّنۡهُمۡ فٰسِقُوۡنَ

২৬. আর অবশ্যই আমরা নূহ এবং ইবরাহীমকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছিলাম এবং আমরা তাদের বংশধরগণের জন্য স্থির করেছিলাম নবুওয়াত ও কিতাব, কিন্তু তাদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করেছিল। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষ বিশেষ নবী-রাসূলের আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমে নূহ আলাইহিস সালাম-এর এবং পরে নবী-রাসূলগণের শ্রদ্ধাভাজন ও মানবমণ্ডলীর ইমাম ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যত নবী-রাসূল ও ঐশী কিতাব দুনিয়াতে আগমন করবে, তারা সব এদের বংশধরের মধ্য থেকে হবে। অর্থাৎ, নুহ আলাইহিস সালাম-এর সেই শাখাকে ঐ গৌরব অর্জনের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যাতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেছেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে যত নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন এবং যত কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তারা সব ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর বংশধর। এই বিশেষ আলোচনার পর পরবর্তী নবী-রাসূলগণের পরস্পরকে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এরপর তাদের পশ্চাতে একের পর এক আমি আমার নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি। পরিশেষে বিশেষভাবে বনী-ইসরাঈলের সর্বশেষ রাসূল ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উল্লেখ করেছেন যিনি শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার শরীয়ত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করে গেছেন। [ইবনে কাসীর]

ثُمَّ قَفَّيۡنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمۡ بِرُسُلِنَا وَ قَفَّيۡنَا بِعِيۡسَى ابۡنِ مَرۡيَمَ وَ اٰتَيۡنٰهُ الۡاِنۡجِيۡلَ ۙ وَ جَعَلۡنَا فِىۡ قُلُوۡبِ الَّذِيۡنَ اتَّبَعُوۡهُ رَاۡفَةً وَّ رَحۡمَةً ؕ وَ رَهۡبَانِيَّةِ ۨ ابۡتَدَعُوۡهَا مَا كَتَبۡنٰهَا عَلَيۡهِمۡ اِلَّا ابۡتِغَآءَ رِضۡوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوۡهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيۡنَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡهُمۡ اَجۡرَهُمۡ ۚ وَ كَثِيۡرٌ مِّنۡهُمۡ فٰسِقُوۡنَ

২৭. তারপর আমরা তাদের পিছনে অনুগামী করেছিলাম আমাদের রাসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মার্‌ইয়াম-তনয় ঈসাকে, আর তাকে আমরা দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তার অনুসারীদের দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া। আর সন্ন্যাসবাদী—এটা তো তারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল। আমরা তাদেরকে এটার বিধান দেইনি; অথচ এটাও ওরা যথাযথভাবে পালন করেনি। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমরা দিয়েছিলাম তাদের পুরস্কার। আর তাদের অধিকাংশই ছিল ফাসিক।

এখানে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী হাওয়ারীগণের বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যারা ঈসা আলাইহিস সালাম অথবা ইঞ্জিলের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের অন্তরে স্নেহ ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা একে অপরের প্রতি দয়া ও করুণাশীল কিংবা সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি তারা অনুগ্রহশীল। এখানে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সাহাবী তথা হাওয়ারিগণের দুটি বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে; তা হচ্ছে, দয়া ও করুণা। এরপর তাদের আরেকটি অভ্যাস বর্ণিত হয়েছে যা তারা আবিস্কার করে নিয়েছিল। আর যা আল্লাহ তাদের উপর আবশ্যিক করে দেন নি। আর সেটা হচ্ছে, সন্যাসবাদ। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

رهبانية শব্দটি رهبان এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। এর অর্থ যে অতিশয় ভয় করে। বলা হয়ে থাকে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম-এর পর বনী-ইসরাঈলের মধ্যে পাপাচার ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে বিশেষতঃ রাজন্যবর্গও শাসকশ্রেণী ইঞ্জীলের বিধানাবলীর প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। বনী-ইসরাঈলের মধ্যে কিছু সংখ্যক খাঁটি আলেম ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তারা এই প্রবণতাকে রুখে দাড়ালে তাদেরকে হত্যা করা হয়। যে কয়েকজন প্রাণে বেঁচে গেলেন তারা দেখলেন যে, মোকাবেলার শক্তি তাদের নেই। কিন্তু এদের সাথে মিলে-মিশে থাকলে তাদের দ্বীন-ঈমান বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তারা স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে নিজেদের জন্যে জরুরি করে নিলেন যে, তারা এখন থেকে বৈধ আরাম-আয়েশও বিসর্জন দিবেন, বিবাহ করবেন না, খাওয়া-পরা এবং ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করার চিন্তা করবেন না, বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণে যত্নবান হবেন না, লোকালয় থেকে দূরে কোনো জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে জীবন অতিবাহিত করবেন।

অথবা যাযাবরদের ন্যায় ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন কাটিয়ে দিবেন যাতে দ্বীনের বিধিবিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে পালন করা যায়। তারা আল্লাহর ভয়ে এই কর্ম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তাই তারা رهبان তথা সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হলো এবং তাদের উদ্ভাবিত মতবাদ رهبانية তথা সন্ন্যাসবাদ নামে খ্যাতি লাভ করে। [কুরতুবী] আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাদের এ কাজের সমালোচনা করেছে; কারণ তারা নিজেরাই নিজেদের উপর ভোগ বিলাস বিসর্জন দেয়া অপরিহার্য করে নিয়েছিল-আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয করা হয়নি। এভাবে তারা নিজেদেরকে শরীয়ত প্রবর্তকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছিল। যা স্পষ্টত: পথভ্রষ্টতা। [ফাতহুল কাদীর]

মোটকথা: সন্যাসবাদ কখনও আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম ছিল না। এটা এ শরীয়তেও জায়েয নেই। হাদীসে এসেছে, একবার উসমান ইবনে মাযউন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকীম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে খুব খারাপ বেশে প্রবেশ করলে তিনি বললেন, তোমার এ অবস্থা কেন? তিনি বললেন, আমার স্বামী সারা রাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করে আর সারাদিন সাওম পালন করে, ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে প্রবেশ করলে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলের কাছে এ ঘটনা বিবৃত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমানের সাথে সাক্ষাত করে তাকে বললেন, হে উসমান! আমাদের উপর সন্যাসবাদ লিখিত হয়নি। তুমি কি আমাকে আদর্শ মনে কর না? আল্লাহর শপথ আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি এবং তাঁর শরীয়তের সীমারেখার বেশী হেফাজতকারী। [মুসনাদে আহমাদ: ৬/২২৬]

তারা দ্বিবিধ ভ্রান্তিতে ডুবে আছে। একটি ভ্রান্তি হচ্ছে তারা নিজেদের ওপর এমন সব বাধ্যবাধকতা আরোপ করে নিয়েছিল যা করতে আল্লাহ কোন নির্দেশ দেননি। দ্বিতীয় ভ্রান্তি হচ্ছে নিজেদের ধারণা মতে যেসব বাধ্য বাধকতাকে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায় বলে মনে করে নিজেদের ওপর আরোপ করে নিয়েছিলো তাঁর হক আদায় করেনি এবং এমন সব আচরণ করেছে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তাঁর গযব খরিদ করে নিয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

২৮. হে মুমিনগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তার রাসূলের উপর ঈমান আন। তিনি তার অনুগ্রহে তোমাদেরকে দেবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দেবেন নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলবে। এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এই আয়াতে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি ঈমানদার কিতাবী মুমিনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। যদিও (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) বলে কেবল মুসলিমগণকে সম্বোধন করাই পবিত্র কুরআনের সাধারণ রীতি। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এই সাধারন রীতির বিপরীতে নাসারাদের জন্য (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এর রহস্য এই যে, পরবর্তী বাক্যে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনার আদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, এটাই ঈসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি বিশুদ্ধ ঈমানের দাবী। তারা যদি তা করে, তবে তারা উপরোক্ত সম্বোধনের যোগ্য হয়ে যাবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার ও সওয়াব দানের ওয়াদা করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর; কুরতুবী]

পৃথিবীতে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির এমন 'নূর' দান করবেন যার আলোতে তোমরা প্রতি পদক্ষেপে স্পষ্ট দেখতে পাবে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের বাঁকা পথ -সমূহের মধ্যে ইসলামের সরল সোজা পথ কোনটি। আর আখেরাতে এমন 'নূর' দান করবেন যার মাধ্যমে পুল সিরাতের অন্ধকার রাস্তা পার হয়ে জান্নাতে যেতে পারবে।

لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

২৯. এটা এজন্যে যে, কিতাবীগণ যেন জানতে পারে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও ওদের কোন অধিকার নেই। আর নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, যাকে ইচ্ছে তাকে তিনি তা দান করেন। আর আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

কিতাবীগণ যেন জানতে পারে, আল্লাহ তা'আলার সামান্যতম অনুগ্রহের ওপরও তাদের কোন অধিকার নেই। সকল অনুগ্রহ আল্লাহ তা'আলার হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। সুতরাং তোমাদের ওপর উম্মাতে মুহাম্মাদীকে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এতে হিংসা-বিদ্বেষের কোন কারণ নেই। হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : তোমাদের পূর্বে যারা বসবাস করেছে তাদের তুলনায় দুনিয়াতে তোমাদের অবস্থান হল তেমন আছরের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত যতটুকু সময়। তাওরাত ধারীদেরকে তাওরাত প্রদান করা হয়েছে তারা তাওরাত অনুযায়ী অর্ধদিন আমল করেছে, তারপর আমল করতে অপারগ হয়ে গেছে। ফলে তাদের আমলের বিনিময়ে এক কিরাত পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়েছে। তারপর ইঞ্জিল ধারীদেরকে ইঞ্জিল প্রদান করা হয়েছে, তারা ইঞ্জিল অনুপাতে আছর পর্যন্ত আমল করেছে, তারপর অপারগ হয়ে গেছে। ফলে তাদের পারিশ্রমিক এক কিরাত প্রদান করা হয়েছে। তারপর তোমাদেরকে কুরআন প্রদান করা হয়েছে, তোমরা কুরআন অনুপাতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমল করেছ। ফলে তোমাদেরকে দু কিরাত পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়েছে। তাওরাতধারীরা বলল : হে আমাদের প্রভু! তারা কম সময় আমল করেছে, কিন্তু প্রতিদান পেয়েছে

বেশি। আল্লাহ তা'আলা বললেন : তোমাদের ওপর কি জুলুম করা হয়েছে। তারা বলল : না, আল্লাহ তা'আলা বললেন : এটা হল আমার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা আমি তা দিয়ে থাকি। (সহীহ বুখারী হা. ৭৪৬৭)

উম্মাতে মুহাম্মাদীর মু'মিন ব্যক্তিরা কম সময় আমল করবে কিন্তু তাদের প্রতিদান পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং আমাদের এ নেয়ামতের প্রশংসাসহ বেশি বেশি সৎআমল করা উচিত।

ফুটনোট

⊡ অতিরিক্ত দুনিয়াপ্রীতি ও পার্থিব জীবনের প্রতি মোহ মানুষকে প্রতারিত করে। এই জীবনের মোহে একবার জড়িয়ে পড়লে তা থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন। এমন সময় মানুষ সম্বিত ফিরে পায় যখন আর কিছু করার থাকে না।

⊡ আল্লাহ ও ধর্মবিহীন জীবন শিশুকালের খেলাধুলার সমতুল্য; যদিও এই খেলার খেলোয়াড়েরা প্রাপ্তবয়স্ক।

⊡ পার্থিব জীবন সবাই কমবেশি উপভোগ করে। কিন্তু একজন ঈমানদার মানুষের উপভোগ হয় আল্লাহ নির্দেশিত পথে। এই দুনিয়া কারো জন্য পরিপূর্ণতা অর্জন করে জান্নাত লাভের মাধ্যম আবার কারো জন্য প্রতারিত হয়ে জাহান্নামের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাওয়ার উপকরণ।

⊡ আখেরাতে মানুষ এ দুটি অবস্থার মধ্যে যে কোন একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফেরদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্যে কঠোর আযাব রয়েছে। অপরটি মুমিনদের অবস্থা; অর্থাৎ তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে।

⊡ দুনিয়ার জীবনের উপমা হলো বৃষ্টি, যার উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর সেগুলো শুকিয়ে যায়, ফলে আপনি ওগুলো পীতবর্ণ দেখতে পান, অবশেষে সেগুলো খড়-কুটায় পরিণত হয়।

⊡ ২০ নং আয়াতে - পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পার্থিব জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এইঃ প্রথমে ক্রীড়া, এরপর কৌতুক, এরপর সাজ-সজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা, এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ।

⊡ দুনিয়াপূজারিরা সম্পদ ও ক্ষমতা লাভের জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলেও ঈমানদার ব্যক্তিরা সৎ কাজ ও নেক আমল করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করে।

⊡ দু'টি কারণে ঈমানদার মানুষেরা জান্নাত লাভ করবেন। এর একটি হলো আল্লাহর মাগফেরাত যার কারণে তিনি মানুষকে ক্ষমা করে দেবেন এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাঁর অনুগ্রহ যার কারণে তিনি মানুষের নেক আমলগুলোকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে তার প্রতিদান দেবেন।

⊡ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসহীন মানুষই কেবল কঠিন পরিস্থিতিতে হতাশ এবং সুখের দিনে উল্লাস ও অহংকার করে। পক্ষান্তরে ঈমানদার মানুষ কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ এবং সুখের দিনে আল্লাহর শোকর আদায় করে।

⊡ স্বাভাবিক আনন্দ প্রকাশ কিংবা দুঃখ পাওয়া দোষণীয় কিছু নয় কিন্তু অতীত নিয়ে অযথা অনুশোচনা করা অথবা যা আছে তা নিয়ে উল্লাস ও অহংকার করা গুনাহের কাজ।

⊡ নিজে কৃপণ হওয়ার চেয়েও বড় অপরাধ হলো অন্যকে কার্পণ্য করতে উৎসাহিত করা। এ কারণে নবী-রাসুলগণ কৃপণ ব্যক্তিদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে এবং তাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

⊡ ধন-সম্পদ অর্জন করার পর তা থেকে কতটা দ্বীনের রাস্তায় খরচ করছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে বহু সম্পদশালী মানুষ আছে যারা কৃপণ আবার অনেক দরিদ্র মানুষ আছে যারা উদারহস্ত।

⊡ ২৫ নং আয়াতে কিতাব ও মিযানের পর লৌহ নাযিল করার কথা বলা হয়েছে।

⊡ হাদীদ শব্দটি কুরআনে ৬ জায়গায় ব্যবহার হয়েছে। সূরা ইসরার ৫০ নম্বর, সূরা কাহফের ৯৬ নম্বর, সূরা হাজ্জের ২১ নম্বর, সূরা সাবার ১০ নম্বর, সূরা ক্বাফের ২২ নম্বর এবং সূরা হাদীদের ২৫ নং আয়াত। প্রত্যেকটিতেই লোহার উপরকরণ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। তবে সূরা ক্বাফের আয়াতে প্রত্যক্ষ করা অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

⊡ মানুষের জীবন-যাপনে লোহার অনেক উপকারিতা রয়েছে, যেমন লোহা দ্বারা কৃষি কাজের উপকরণ তৈরি করা, দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত দা, চাকু ইত্যাদি তৈরি করা। যুদ্ধ-জিহাদের অস্ত্র তৈরি হয় এ লোহা দ্বারাই।

⊡ নবী-রাসূলগণ মানুষকে গুনাহ ও জুলুম পরিহার করে নেক কাজ করার জন্য জোর-জবরদস্তি করতেন না। তাঁরা বরং সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ডগুলো তাদের সামনে স্পষ্ট করে দিতেন যাতে মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তাদের কাঙ্ক্ষিত পথ বেছে নিতে পারে।

⊡ মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের পাশাপাশি নবী-রাসূলদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।

⊡ নূহ (আঃ) ও ইবরাহীম (আঃ)-এর পর যত কিতাব নাযিল ও নাবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন সকলেই তাদের উভয়ের বংশধর থেকে এসেছেন। নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের পর দুনিয়াতে মু'মিন ছাড়া কেউ ছিল না। তাই সকল মু'মিনকে নূহ (আঃ)-এর বংশধরের মধ্যে শামিল করা হয়। আর ইবরাহীম (আঃ)-এর দু' ছেলে ইসহাক ও ইসমাঈল (আঃ) উভয়ে নাবী ছিলেন। তার মধ্যে ইসহাক (আঃ) থেকে ইয়াকূব, ইয়াকূব থেকে ইউসুফ এভাবে বানী ইসরাঈলের সকল নাবীগণ আগমন করেছেন আর ইসমাঈল (আঃ) থেকে কেবল নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমন করেছেন।

⊡ দ্বীনের ভেতরে নিজের মনগড়া কিছু তৈরি করা বিদ'আত। যদিও তা নিজের কাছে ভাল লাগে। বিদআতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিল করা যায় না।

⊡ দ্বীনের ভেতর কোন বাড়াবাড়ি নেই। যারাই দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করবে দীন তাদের ওপর জয় লাভ করবে।

⊡ ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই।

⊡ আল্লাহ তা'আলা ও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর সঠিক ঈমান এনে আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জন করত তাঁকে যথাযথ ভয় করে চললে দ্বিগুণ প্রতিদান, সঠিক পথে চলতে পারলে আলোকবির্তকা ও অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।

⊡ সকল নেয়ামত ও অনুগ্রহের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

⊡ উম্মাতে মুহাম্মাদীর অন্যতম একটি ফযীলত হল তারা সকল উম্মতের চেয়ে বেশি মর্যাদাবান, তারা কম সময় আমল করেও বেশি সময় আমলকারীদের চেয়ে অনেক বেশি প্রতিদান পাবে।